বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ওষুধ

লিখেছেন **সুভাষ সিংহ রায়**

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের অগ্রগতি বেশ চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে ১৯৮২ সালের ওষুধনীতির পর থেকে এ শিল্পকে আর কখনই পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কিন্তু শুরুটা মোটেই এরকম ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বের ইতিহাস খুবই করুণ। বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্প খাতের মতো ফার্মাসিউটিক্যালও খুব অবহেলিত ছিল। অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানির উৎপাদন সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়েছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ শুরুতে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে জরাজীর্ণ অবস্থার উত্তরাধিকার লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম ওষুধ শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে 'ওষুধনীতি' প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। সেখান থেকে এখন ২০০৫ সালে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্পে একটি আত্মনির্ভরশীল দেশ। প্রতিবেদনের শুরুতে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের উন্নতির পাঁচটি দিক নিয়ে আলোচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে।

১. জনগোষ্ঠীর বড় একটা অংশের ওষুধের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহামারী আকারের রোগ আর বাংলাদেশে নেই। কলেরা, ডেঙ্গু, টাইফয়েডসহ এক সময়ের জীবননাশা অনেক রোগ এখন বলতে গেলে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আছে। দেশের মানুষের গড় আয়ু আনেক বেড়েছে, এখন আমাদের গড় আয়ু ৬২। ইন্ডিয়ানা সাব-কন্টিনেন্টের দেশগুলোর মধ্যে সবার ওপরে।

২. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই চাহিদার ৯৭ ভাগ ওষুধ উৎপাদিত হয়। আমদানিকৃত বাকি ৩ ভাগের মধ্যে রয়েছে প্রধানত ইনসুলিন, ভ্যাকসিন এবং কিছু এন্টি-ক্যান্সার ড্রাগ।

৩. ১৯৮২ সালের ওষুধনীতির আগে আমাদের প্রয়োজনীয় ওষুধের ৮০ ভাগ সরবরাহ করতো এ দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। আর এখন দেশীয় চাহিদার ৮০ ভাগ পূরণ করছে দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলো। তাছাড়া এ দেশীয় কিছু ওষুধ কোম্পানি আমেরিকার এফডিএ ও ব্রিটেনের এমএইচআরএ মানের ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪. দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো এখন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে।

৫. বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুসারে ওষুধ প্রস্তুত করছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চীন, ইন্ডিয়া, ব্রাজিল, তুর্কি ইত্যাদি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বাংলাদেশে ফার্মাসিউটিক্যাল একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত। ২০০৪ সালের বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটে আনুমানিক ২৮ হাজার ৪১৬ মিলিয়ন টাকার লেনদেন হয় (যেখানে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ১০%)। বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প নিজস্ব চাহিদা পূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গার্মেন্টসের পর বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজস্ব আয়কারী শিল্প এবং দেশের বৃহত্তম চাকরি খাত।

বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত জেনেরিক ওষুধের সংখ্যা ৪৫০টি। এই ৪৫০টির মধ্যে ১১৭টি নিয়ন্ত্রিত ধরনের। অর্থাৎ এগুলো অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় রয়েছে। অবশিষ্ট ৩৩৩টি জেনেরিক ওষুধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশের মোট তালিকাভুক্ত ব্র্যান্ডের সংখ্যা ৫ হাজার ৩০০ যেখানে ডোজের ভিন্নতা ও শক্তিমাত্রার ভিন্নতার ভিত্তিতে এ সংখ্যা ৮ হাজার ৩০০।

বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প প্রধানত দেশীয় উৎপাদনকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটের ৮০ ভাগের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে দেশীয় কোম্পানিগুলোর হাতে। আর বাকি ২০ ভাগের নিয়ন্ত্রণ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে।

বাংলাদেশের শীর্ষ দশটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মধ্যে আটটিই দেশীয় কোম্পানি, যেখানে বহুজাতিক কোম্পানি মাত্র দুটি। দেশীয় উৎপাদনকারী কোম্পানির শীর্ষ দুটি স্কয়ার এবং বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের যৌথ বাজার অংশীদারিত্ব দেশের মোট ফার্মাসিউটিক্যাল বাজারের প্রায় ২৫ শতাংশ।

বাংলাদেশে ওষুধ উৎপাদনের ভিত্তি বেশ দৃঢ়। কারণ অধিকাংশ কোম্পানির নিজস্ব কারখানা রয়েছে। বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ ওষুধের চাহিদাই দেশীয় উৎপাদন দিয়ে মেটানো হয়, যেখানে আমদানি নির্ভর দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে তা হয় না। বাকি পাঁচ শতাংশ আমদানি হয় প্রধানত ভ্যাক্সিন, ক্যান্সাররোধক ইত্যাদি ওষুধ।

অতি সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি বিল পাস হয়েছে। যার ফলে অনেকে আশঙ্কা করছেন উন্নয়নশীল বিশ্বে ভারত যেসব সহজলভ্য ওষুধ বিক্রি করত তার অবসান ঘটবে। উক্ত বিলে ভারতীয় প্যাটেন্ট আইনে যথেষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ মুহূর্তে বাজারে প্রচলিত জেনেরিক এইডস রোধক ওষুধের প্রাপ্যতার শর্ত সংবলিত

এ বিলে যদি ভারতীয় রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেন তবে জীবন রক্ষাকারী নতুন ওষুধ প্রাপ্তি বিলম্বিত হবে এবং ওষুধের মূল্য ১৯৯৫ সালে প্রবর্তিত মূল্যের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। বিলের ভাষায় অস্পষ্টতার কারণে যথেষ্ট মামলা-মোকদ্দমা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা কি না ছোট ছোট জেনেরিক কোম্পানিকে নিরুৎসাহিত করবে এবং তারা নতুন ওষুধ তৈরির ঝুঁকি থেকে বিরত থাকবে।

ভারতীয় কোম্পানিগুলো এখন আর এসব ওষুধ রপ্তানি করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে এসব দেশে স্বল্পমূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা সম্ভব। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেরই তুলনামূলক শক্তিশালী অবকাঠামো রয়েছে, যে অবকাঠামোর সম্প্রসারণও অতি দ্রুত সম্ভব। এছাড়া বাংলাদেশের রয়েছে প্রয়োজনীয় জনবল। সুতরাং বাংলাদেশের পক্ষে বহির্বিশ্বের এই বাজারে প্রবেশ খুব অসম্ভব কিছু নয়। অবশ্য ইতিমধ্যে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী ৫টি এইডস রোধক ওষুধ উৎপাদন শুরু করেছে এবং কেনিয়াসহ পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোতে নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদন করেছে।

বাংলাদেশে গত বছর ৭০০ মিলিয়ন ডলারের ওষুধ উৎপাদিত হয়েছে; যার মধ্যে ২৫ মিলিয়ন ডলার আয় হয় রপ্তানির মাধ্যমে।

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের প্লান্ট ডাইরেক্টর পারভেজ হাশিমের মতে, ভারতের নতুন প্যাটেন্ট আইনে সস্তা জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন নিষিদ্ধ করায় বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো আশা করছে তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২০১৬ পর্যন্ত ভারতের নীতিমালা প্রযোজ্য নয়। কারণ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত ৪৯টি দেশের মধ্যে একটি।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বেক্সিমকোর প্রধান নির্বাহী নাজমুল হাসানের অভিমত, 'ভারতের আইন আমাদের জন্য বিরাট এক সুযোগ। কারণ আমাদের কোম্পানিগুলো প্যাটেন্টকৃত ওষুধের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারবে, যা ভারত পারবে না।' বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসানের মতে, আমরা এখন ভারতীয়দের তুলনায় কম মূল্যে এইডসরোধক ও ক্যান্সারের জেনেরিক ওষুধ বিক্রি করতে পারব। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিকে বড় একটি সুযোগ হিসেবে দেখছি এবং রপ্তানির এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আমাদের কিছু নীতিমালা অনুযায়ী ওষুধের যথাযথ মান নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কোম্পানি

†miv 14 Ila †Kv¤úvbx

†h †Kv¤úvbx¸‡jv eZgv‡b evsjv‡`‡ki Ila wk‡íi c‡ivav wn‡m‡e mbvg ARb K‡i‡Q †m¸‡jvi g‡a¨ i‡q‡Q: স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল, একমি, বেক্সিমকো ফার্মা, এভেনটিস, অপসোনিন বাংলাদেশ, গ্লাক্সো, ইনসেপ্টা, এস+কে+এফ, ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল, নোভার্টিস, এসিআই, রেনাটা, এরিস্টোফার্মা, অর্গানন

স্কয়ারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ গত বছর ছিল ১০০ মিলিয়ন ডলার। এ কোম্পানি গত বছর ৪০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি প্লান্ট স্থাপন করেছে। তারা এখন এফডিএ ও ব্রিটেনের ড্রাগ অথরিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। উৎপাদন পরিচালক পারভেজ হাশিমের বক্তব্য অনুযায়ী, শিগগিরই স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল এইডসরোধ ওষুধ উৎপাদন শুরু করবে।

তিনি আরো বলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কোম্পানিগুলো তাদের প্লান্ট বাংলাদেশে স্থানান্তরিত করতে পারে এবং এসব ওষুধ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারে।

ভারতের নতুন আইন বাংলাদেশের জন্য এক অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। যার ফলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতির অগ্রগতিতে সহায়ক হবে।

দেশের খ্যাতনামা ওষুধ উৎপাদকরা মনে করেন, এ সবই সম্ভব যদি আমরা এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

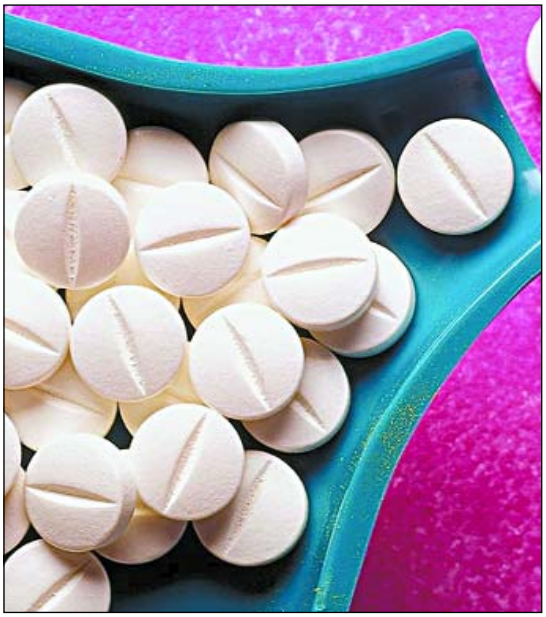

বৈদেশিক বাজার : পূর্ব ও বর্তমান

বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানির ইতিহাস শুরু হয় আশির দশকের শেষের দিকে। সেই সময় বাংলাদেশের একটি বা দুটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ওষুধ রপ্তানিতে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট ছিল। যদিও সরকারের তরফ থেকে কোনো সাহায্য বা উৎসাহ ছিল না, তবু এ কোম্পানিগুলো প্রতিবেশী কম বাজার নিয়ন্ত্রিত দেশ যেমন- মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও নেপালে ওষুধ রপ্তানির নিজস্ব পদক্ষেপ শুরু করে।

এসব কম নিয়ন্ত্রিত বাজারে সাফল্য পাবার পর নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে আমাদের দেশের কিছু বড় কোম্পানি রাশিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া সিঙ্গাপুরের মতো বেশি নিয়ন্ত্রিত বাজারে রপ্তানি করার পদক্ষেপ নেয়। এই দেশগুলোতে এসব ওষুধ তালিকাভুক্ত ও বিক্রিতে সাফল্য বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির জন্য একটি বিরাট পাওয়া। এটা শুধু আমাদের চমৎকার পণ্য মানের নয়, বরং আমাদেরকে কঠোর এবং নিয়ন্ত্রিত ওষুধ বাজারের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতাকে প্রমাণ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প সাফল্যের সঙ্গে চারটি মহাদেশের প্রায় ৫২টির মতো দেশে মানসম্মত ওষুধ রপ্তানি শুরু করেছে। সম্প্রতি কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বিপুল পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করছে যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সব ধরনের থেরাপিউটিক ও ডোজ রয়েছে। নিয়মিত ব্র্যান্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশ উন্নত প্রযুক্তির বিশেষ পণ্য যেমন- ইনহেলার, সাপজিটরি, নাকের স্প্রে, ইনজেকশন, ইনফিউশনও রপ্তানি করছে। পণ্যগুলোর মান, প্যাকেজিং এবং উপস্থাপন রপ্তানিকৃত দেশগুলোতে খুবই প্রশংসিত হয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি-পরবর্তী সুবিধাসমূহ

২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশের ফার্মা সেক্টরের জন্য একটি বিশাল সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে। WTO/TRIPS চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে চীন এবং ভারতের মতো দেশগুলোতে ইতিমধ্যে প্যাটেন্ট আইন বলবৎ হয়ে গেছে। ফলে এ দেশগুলোর আর প্যাটেন্ট করা ওষুধ রপ্তানি করার অনুমতি নেই। অপর পক্ষে বাংলাদেশের জন্য পরিস্থিতি ঠিক উল্টো। স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশের সদস্য হবার কারণে আমাদের দেশ ইতিমধ্যেই ১ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত প্যাটেন্ট আইন থেকে রেহাই পেয়েছে, যা দেশের ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের অফুরন্ত রপ্তানি সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। যদিও বাকি ৪৮টি এলডিসি দেশও এ সুযোগ পেয়েছে; কিন্তু তারা মূলত ওষুধ আমদানি নির্ভর এবং আমাদের রপ্তানির

সুযোগ নষ্ট করার ক্ষমতা তাদের নেই।

এর সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য রপ্তানি করে আরো বিপুল পরিমাণ বৈদিশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে, যেহেতু এর স্থানীয় মূল্যের চেয়ে রপ্তানি মূল্য অনেক বেশি। যেমন- ফ্লুকোনাজল ক্যাপসুলের দাম বাংলাদেশে ৮ টাকা, যেখানে এটি পাকিস্তানে রপ্তানি হয় ৩৮ টাকায়। একইভাবে প্যারাসিটামল সিরাপের বাংলাদেশ মূল্য ১৩ টাকা, কিন্তু রাশিয়ায় এটি রপ্তানি হয় ১০০ টাকা দামে।

বাধ্যতামূলক অনুমতিপত্র

যেসব দেশে ফার্মাসিউটিক্যাল প্যাটেন্ট ১ জানুয়ারি, ২০০৫ থেকে কার্যকর হবে সেখানে 'বাধ্যতামূলক অনুমতিপত্র' জাতীয় জরুরি প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত বা সম্ভাব্য উপায় নয়। জাতীয় জরুরি ক্ষেত্রে পণ্যগুলোর 'বাধ্যতামূলক অনুমতিপত্র' পেতে দুই-তিন বছর সময় লাগতে পারে। কেননা, সাধারণ উৎপাদনকারী কোম্পানি 'ওষুধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উৎপাদনের অনুমতি লাভের পর এ পদ্ধতিগুলোর (যেমন- উৎপাদন, পণ্যের মানোন্নয়ন, মানের স্থায়িত্ব পরীক্ষা ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে যেতে হবে পণ্য উৎপাদনের জন্য। জীবন রক্ষাকারী প্যাটেন্টের তাৎক্ষণিক উৎপাদনে বাংলাদেশ একটি আদর্শ প্রার্থী হতে পারে। কেননা, আমাদের সমস্ত উৎপাদন সুযোগ এবং উন্নত আর এন্ড ডি (R&D) ফর্মুলেশন রয়েছে।

যৌথ উদ্যোগে সুবিধাসমূহ

ভারত ও চীনের ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে (API) এবং (R&D) ফর্মুলেশনের ক্ষেত্রে। তারা এখন দেশের বাইরে এপিআই উৎপাদন করতে পারে, যেহেতু তারা প্যাটেন্ট করা এপিআইগুলো ২০০৪ সালের পর উৎপাদন করতে পারবে না।

উপকূল সুবিধা থাকার কারণে বৃহৎ ফার্মা কোম্পানি যাদের উঁচুমানের নিয়ন্ত্রিত বাজার রয়েছে তারা যৌথ প্রকল্পের দিকে এগোচ্ছে। তারা ইতিমধ্যে ভারত এবং চীনের কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কতিপয় চুক্তি করেছে। বাংলাদেশের অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এসব বৃহৎ আন্তর্জাতিক কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদন করার।

পরোক্ষ উৎপাদন

আজকাল বেশির ভাগ কোম্পানি উৎপাদন সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। উৎপাদন খরচ, লাভের কথা বিবেচনা করে বেশির ভাগ কোম্পানি তাদের সম্পদ এবং অভিজ্ঞতা বাজারজাতকরণে খাটায়। উৎপাদনের কথা বিবেচনা করে বেশির ভাগ কোম্পানি আজ পরোক্ষভাবে উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছে। যেহেতু বাংলাদেশের খুব শক্ত উৎপাদন ভিত্তি রয়েছে সেহেতু অন্যান্য দেশ তাদের পণ্যগুলো বাংলাদেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন করতে পারে।

যদিও বিগত বছরগুলোতে এ খাতে বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে এবং কয়েকটি কোম্পানি আমরিকার FDA ও বৃটেন MHRA-এর মান অনুযায়ী উৎপাদন সুবিধাসম্পন্ন প্লান্ট স্থাপন করেছে। এখন এসব কোম্পানি ঐসব দেশে নিয়মিত মার্কেট অনুমোদনের দিকে এগোচ্ছে।

সুযোগ-সুবিধাগুলো কাজে লাগানো

যেহেতু ভারত, চীন এবং বর্তমান বিদ্যমান সব কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, যেহেতু এটা আশা করা যায় যে তারা ২০০৫ সালের পর থেকে আর প্যাটেন্ট করা পণ্যগুলোর জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করবে না। আর যদি করেও তাহলে রপ্তানি করার অনুমতি পাবে না। যেহেতু বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হবার কারণে প্যাটেন্ট করা পণ্য উৎপাদনের অনুমতি পাবে। কিন্তু এটা অজানা যে ২০০৪ সালের পর আমরা কোথায় কাঁচামাল/এপিআই (অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) পাবো এ ওষুধগুলো উৎপাদনের জন্য। অতএব বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে ওষুধ অবকাঠামো এবং আধুনিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের বাজার এ বিনিয়োগকে সম্ভব করার পক্ষে খুবই ছোট। এ উদ্যোগকে সম্ভব করার জন্য ওষুধ অবকাঠামো এবং গবেষণা প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য কম সুদে ব্যাংক লোন দেয়াসহ সব ধরনের যন্ত্রাংশ এবং গবেষণা প্রকল্প

কঠোর নিয়ন্ত্রিত

এই শ্রেণীতে রয়েছে আমেরিকা, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মার্কেট। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্কেটে বাজারজাত করতে হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমতুল্যতার জন্য সার্টিফিকেট নিতে হবে। CH- এবং CTD নিশ্চিত করতে হবে আমেরিকার বাজারের জন্য FDA অনুমোদন থাকতে হবে। এসব দেশের রেজিস্ট্রেশন পাবার জন্য কিছু পদ্ধতি দরকার যা বাংলাদেশী কোম্পানিগুলোর জন্য কঠিন। কারণ এখানে অনেক সুবিধার ঘাটতি আছে। যেমন কোনো পণ্যে জৈব-সমতুল্যতার পরীক্ষা। এখানে এ জাতীয় পরীক্ষা করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। তাছাড়া ব্যয়বহুলও বটে। আমাদের ওষুধ কোম্পানিগুলো গুণগত দিকটা মেনে চলে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য standard reference জমা দেয়া দরকার যা সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। আরেকটি বিষয় clinical trail। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে রোগীদের clinical trail-এ আনা যায়।

মধ্যম নিয়ন্ত্রিত (Moderately Regulated)

এসব দেশের জন্য bioequivalance বা standard reference-এর দরকার হয় না। এই দেশগুলোর পণ্যের কার্যকরী আদর্শ নমুনা গ্রহণ করে রেজিস্ট্রেশন দেয়। কিন্তু এদেরও কিছু দেশে রেজিস্ট্রেশন ফি এতো বেশি যে মধ্যম মানের কোনো কোম্পানি এদের দেশে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন রাশিয়াতে এশটি প্রোডাক্টে রেজিস্ট্রেশন ফি ২৫ থেকে ৩৫ হাজার ডলার।

কম নিয়ন্ত্রিত (Less Regulated)

এসব মার্কেটে রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি খুব সহজ। যেমন- bioequivalance test clinical trial and reference standard এখানে দরকার হয় না। তাদেরকে শুধু পরীক্ষার জন্য নমুনা জমা দিতে হয় এবং যদি সন্তোষজনক ফলাফল হয় তবে সেখানে ওষুধ বাজারজাত করার অনুমতি পাওয়া যায়। এখানে নমুনার সঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জমা দিতে হয়। যেমন- free sales certificate, DT certificate, certificate of analysis, certificate of registration ইত্যাদি। এগুলো খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। যে সমস্ত কোম্পানিগুলো CGMP মেনে চলে তারা সহজে এসব কাগজপত্র দিতে পারে। অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশ ও এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশের ওষুধের বিশাল বাজার রয়েছে।

আমদানিতে করমুক্তি প্রয়োজন।

ফার্মাসিউটিক্যাল কাঁচামালের শিল্প এলাকা

বাংলাদেশে বর্তমানে কঠিন এবং তরল উভয় ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাই নিজ নিজ উৎপাদনকারী দ্বারা পরিচালিত হয়, যা পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অপরদিকে, ভারত এবং চীনে দহনযন্ত্র এবং ETP (তরল বর্জ্য শোধন যন্ত্র) আছে যথাক্রমে কঠিন এবং তরল বর্জ্যের প্রক্রিয়াজাত করার জন্য। সুতরাং, এ দেশগুলো খুব সাফল্যের সঙ্গে তাদের ওষুধ উৎপাদন খরচ কমাতে পেরেছে।

যদিও TRIPS চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের রপ্তানি সুযোগ নেই, তবু তারা লাহোরে 'সুন্দর শিল্প অঞ্চল' নামে একটি শিল্প অঞ্চল তৈরি করেছে প্রায় ১ হাজার ৫০০ একর পতিত ভূমি এবং যৌথ তরল বর্জ্য শোধন কেন্দ্র নিয়ে।

কাঁচামাল/এপিআইর সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের মূল্যও বৈদেশিক বাজারে আরো বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতো যদি বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে দহনযন্ত্র এবং তরল বর্জ্য শোধন কেন্দ্র থাকত।

আমদানিকৃত পণ্যের জন্য নিবন্ধীকরণের আবশ্যকীয় শর্ত

বেশির ভাগ দেশই যেমন- ভারত, চীন এবং সিঙ্গাপুর ইতিমধ্যে নতুনদের জন্য তাদের আমদানিকৃত পণ্যের ওপর নিবন্ধীকরণের শর্ত পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রিত বাজারের মত কঠোর করেছে। এই দেশগুলো এইভাবে নিম্নমানের ওষুধ অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করেছে। এ দেশগুলোর মতো উগান্ডা এবং তানজানিয়াও তাদের নিবন্ধীকরণ শর্ত উন্নীত করেছে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর । যদিও তাদের ওষুধের বাজার আমদানিকৃত পণ্যের ওপর নির্ভরশীল।

অন্যদিকে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য নিবন্ধীকরণ শর্ত বাংলাদেশে চূড়ান্ত পর্যায়ে শিথিল। যদি অবিলম্বে যথাযথ মনোযোগ না দেওয়া হয়, তবে বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল বাজার প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসা নিম্নমানের পণ্যে ভেসে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ছোট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর উৎপাদন অবকাঠামো এবং দলিলপত্রের উন্নতি করাও অনতিবিলম্বে প্রয়োজন।

স্বনির্ভর ওষুধ পরীক্ষাগার

বাংলাদেশে দুটি ওষুধ পরীক্ষাগার আছে : একটি ঢাকায় এবং আরেকটি চট্টগ্রামে। এ দুটি ওষুধ পরীক্ষাগার সব সময় অসংখ্য ওষুধ পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকে, যা দেশীয় খাতে সক্রিয় প্রায় ২০০ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থেকে উৎপাদিত হচ্ছে।

আর রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য এ অবকাঠামোগুলো তত আধুনিক এবং যুগোপযোগী নয়। অন্যদিকে অবকাঠামোগুলোর প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেশি অনুভূত হচ্ছে।

পূর্বে উল্লিখিত দৃশ্যপট বিবেচনা করে বাংলাদেশের ওষুধ উৎপাদনকারীরা সরকারের একটি স্বাধীন, আধুনিক, সময়োপযোগী পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এমন ওষুধ পরীক্ষাগার তৈরির জন্য অনুরোধ করছে।

ওষুধ এবং কাঁচামাল রপ্তানিতে সাহায্য এবং সমর্থন

১৯৯০ থেকে ভারত সরকার ওষুধ এবং এপিআই রপ্তানির জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ ও উৎসাহ দেবার প্রস্তাব করছে। চীনের ওষুধ রপ্তানিতে ব্যাপক উৎসাহ রয়েছে। অপর পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের ওষুধ রপ্তানিতে তেমন কোনো উৎসাহ নেই। যার ফলে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়ছে, যেখানে ভারত এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও ভারত সরকারের এসব উৎসাহ বন্ধ করে দেবার কথা কিন্তু বাস্তবে তারা এখনো এ উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারত সরকার সব সময় ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য রপ্তানির ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয়। ভারতীয় ওষুধ রপ্তানির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন শুল্ক আরোপ করায় পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে ভারত। ইইউ'র স্পিরিট ও মদ জাতীয় পণ্যের ওপর একই জাতীয় পণ্যের ওপর একই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে তারা। কারণ সম্প্রতি ইইউ ভারতীয় অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধের ওপর শুল্ক আরোপ করেছে। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইইউ দেশগুলোর উৎপাদিত স্পিরিট ও মদ জাতীয় পণ্যের ওপর অধিক হারে শুল্ক বসানোর চিন্তা-ভাবনা করছে। এটা ভারতীয় ওষুধ শিল্পকে প্রোটেকশন দেয়ার জন্য ভারতীয় সরকারের কৌশল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যখনই ভারত এ জাতীয় বিধিনিষেধ নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিচার দিতে উদ্যোগী হয় তখনই ইইউ সে বিধিনিষেধ তুলে নেয়।

অথচ বাংলাদেশ সরকারের ওষুধ শিল্প বিকাশের কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। আজকের যতটুকু অগ্রগতি সবটায় বেসরকারি খাতের উদ্যোগ। যেমন, বৈদেশিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অনতিবিলম্বে ওষুধের ক্ষেত্রে ২০% এবং কাঁচামালের ক্ষেত্রে ৩০% নগদ ভর্তুকি প্রদান করা উচিত।

জাতীয় প্যাটেন্ট আইন

চুক্তি অব্যাহতি সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের উচিত প্যারালাল ইমপোর্ট, বাধ্যতামূলক অনুমতিপত্র, বোলার নীতির মতো বিষয়গুলো, জাতীয় প্যাটেন্ট আইন উপস্থাপন ও একত্রীকরণ করা। এর ফলে WTO/TRIPS-এর নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে। এটা না করা হলে রপ্তানির সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ফার্মাসিউটিক্যাল প্যাটেন্ট আইন থেকে অব্যাহতি দেয়া সত্ত্বেও দেশে বিদ্যমান প্যাটেন্ট আইনের জন্য এ সুযোগ গ্রহণ সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। ওপরের বিষয়টি বিবেচনা করে ২০০১ সাল-পরবর্তী সুবিধা গ্রহণে এখনই জাতীয় প্যাটেন্ট আইন সংশোধন করা উচিত ।

এ লক্ষ্যে করণীয়

ক) WTO/TRIPS-এর নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৬ সাল পর্যন্ত ফার্মাসিউটিক্যাল প্যাটেন্ট আইন কার্যকর হবে না।

খ) প্যারালাল ইমপোর্ট : প্যারালাল ইমপোর্টের অনুমতি দিতে হবে এবং বৈদেশিক রপ্তানির দিকে আরো বেশি করে ঝুঁকতে হবে।

গ) বাধ্যতামূলক অনুমতিপত্র : দেশে ব্যবহার এবং রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অনুমতিপত্র ব্যবহৃত হতে পারে।

যাই হোক, বাংলাদেশের প্যাটেন্ট আইনের এ সংস্কারের জন্য আরো দুই বছর প্রয়োজন এবং ২০০৭ সালের আগে এসব সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এরূপ প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও আসছে বছরগুলোতে বাংলাদেশের জন্য রপ্তানির প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এখনো চীন ও ভারতের ব্র্যান্ডসম্পন্ন জেনেরিক ওষুধ রপ্তানি চোখে পড়ার মতো। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে এটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। উল্লিখিত পন্থাগুলো অনুসরণ করা হলে আসছে বছরগুলোতে বাংলাদেশ ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকার ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণের জন্য যদি আমরা প্রস্তুত হতে পারি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।